প্রাপ্তবয়স্কের গল্প

সম্পাদনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তপনকুমার দাস

ভূমিকা

বিষ্ণু বসু

পুনশ্চ

PRAPTABAYASKER GALPO
An Anthology of Bengali love Stories
Edited by
Sunil Gangopadhyay
Tapan Kumar Das

First Published
Book Fair, 2003
Enlarged Edition
December, 2023
ISBN 81-7332-430-5
Price ₹ 750

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ২০০৩
পরিবর্ধিত সংস্করণ
ডিসেম্বর, ২০২৩
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুব্রত চৌধুরী
দাম ₹ ৭৫০

পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং শিবানী প্রিন্টিং ১৭এ, স্যার গুরুদাস রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত ফোন - ৮৯১০২৮৩৪৪৮
Email: punaschabooks@gmail.com
Web: www.punaschabooks.com

সাহিত্যমনস্ক সাহসী পাঠকের হাতে

আমার কথা

বাংলা গদ্যসাহিত্য প্রথম থেকেই উঁচু তারে বাঁধা। তার কারণ, বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্যবশত গদ্যের ভিত্তি স্থাপনের সময়ই বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের মতন দু'জন বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছিল। বিদ্যাসাগর এনে দিলেন দৃঢ় বাঁধুনি, তাতে রসসঞ্চার করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

কৃতবিদ্য বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভারতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, আবার পশ্চিমী সাহিত্যও গভীরভাবে পাঠ করেছেন। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে বাংলা সাহিত্য যে রূপ পেয়েছে, অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় সেই সুযোগ পেতে অনেক সময় লেগেছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে নব-রসের বৈচিত্র্য থাকলেও ইংরিজি সাহিত্য পাঠ করে আমরা একটি নতুন রসের সন্ধান পেয়েছি, যা সংস্কৃত সাহিত্যে নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের সঙ্গে শারীরিক কামনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মেঘদূতে বিরহিনীর যে আর্তি তার প্রায় সবটাই শরীরী মিলনের আকাঙ্ক্ষা। এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তব ও সত্য ঠিকই, তবু প্রেমের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই বাস্তবতার ঊর্ধ্বেও কিছু থাকে। যাকে বলা হয় রোমান্টিসিজ্‌ম, যার বাংলা বা সংস্কৃত কোনো প্রতিশব্দ নেই, ইওরোপেও মধ্যযুগে এই রোমান্টিসিজ্‌মের স্বাদ জানা ছিল না। রোমান্টিক প্রেম একেবারে শরীর-বর্জিত নয়, কিন্তু প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে খানিকটা দূরত্ব তৈরি হলে সেই ব্যাকুলতার মধ্যে থাকে কাব্য-সুষমা। সেখানে আদিরস থাকে আড়ালে। এই রোমান্টিসিজ্‌ম আমরা পেয়েছি ইউরোপ থেকে এবং বঙ্কিমের রচনায় দেখেছি তার নতুন দীপ্তি। আমাদের বৈষ্ণব পদাবলিতেও এই রসের কিছু কিছু ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু তা আধ্যাত্মিকতা দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পংক্তি 'রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়', অবশ্য এই রসের উদাহরণ হতে পারে না। একেবারে কামগন্ধহীন প্রেম ভণ্ডামির মতন শোনায়। বরং টমাস মুরের কয়েকটি পংক্তি বুঝিয়ে দেয় এই প্রেমের স্বরূপ :

> At the mid hour of night, when stars are weeping, I fly
> To the lone vale we loved, when life shone warm in thine eyes.

বঙ্কিমের পরবর্তী লেখকদের পক্ষে গদ্যসাহিত্যের এই উচ্চমান থেকে খুব নীচে নামা সম্ভব ছিল না। কারণ পাঠকরাও এর মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আসরে এসেছেন পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে এবং সুদীর্ঘকাল পরবর্তী লেখকদের প্রভাবিত করে রাখবেন, এটাও যেন নির্দিষ্ট ছিল। একমাত্র শরৎচন্দ্রই সরে গিয়েছিলেন খানিকটা এবং তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে ছিল নতুন পাঠকশ্রেণি। বঙ্কিম-রবীন্দ্র সাহিত্যের পাঠকরা শরৎচন্দ্রকে খুব সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেননি, শরৎচন্দ্র প্রধানত আদৃত হয়েছিলেন গ্রাম-বাংলায়। কিন্তু তাঁর পরবর্তী বাংলা সাহিত্য তাঁকে অনুসরণ করেনি, বড়ো বড়ো প্রতিভাবান লেখকদের আগমনে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধারা।

সূচিপত্র

পরকীয়া	বিপিনচন্দ্র পাল	১৯
কঙ্কাল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর	প্রমথ চৌধুরী	৩৬
নিকষিত হেম	রাজশেখর বসু	৪৭
সাতদিন	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫১
আদি কথার একটি	জগদীশ গুপ্ত	৬৫
কমপিটিশন	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৮
যৈবন	রমেশচন্দ্র সেন	৮৫
রামায়ণী কারবার	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৯১
বেদেনী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০২
চান্দ্রায়ণ	বনফুল	১১২
বহুবিঘ্নানি	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১২২
পত্রলেখার বাবা	সতীনাথ ভাদুড়ী	১৩১
তারপর?	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪১
রজনী হ'লো উতলা	বুদ্ধদেব বসু	১৪৬
পরশুরামের কুঠার	সুবোধ ঘোষ	১৫৬
অভিমান	সুমথনাথ ঘোষ	১৬৫
প্রস্তাব	আশাপূর্ণা দেবী	১৭৭
রিফিউজি মেয়ে	প্রতিভা বসু	১৮১
সোহাগিনী	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৮৮
ছলনাময়ী	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২০২
বার্নিং ব্রাইট	বাণী রায়	২১১
ছায়া-প্রচ্ছায়া	মিরজা আবদুল হাই	২১৬
উপহার	আবু রুশ্‌দ্‌	২২৭
বরফ সাহেবের মেয়ে	বিমল কর	২৩৩
প্রদত্তার নগ্নদেহ	রমাপদ চৌধুরী	২৫১
স্তন	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	২৫৬
রূপালি মাছ	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২৬৩
রূপদর্শীর চতুর্থ গুল্ক	গৌরকিশোর ঘোষ	২৭১

পোকা	সমরেশ বসু	২৭৬
স্বৈরিণী	বাণী বসু	২৮৮
নাগিনী ছন্দ	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	২৯৮
পরী	আলাউদ্দিন আল আজাদ	৩০৩
কাচের পাখির গান	মুর্তজা বশীর	৩০৯
নিশীথে সুকুমার	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	৩২১
চর্যাপদের হরিণী	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৮
মাঝখানের দরজা	সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়	৩৩৭
মধ্যরাত্রির অতৃপ্তি	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৪৫
প্রদর্শনী	প্রফুল্ল রায়	৩৫৪
যৌবনের অপ্সরী	আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন	৩৬২
রুচিরা	আবদুল গাফফার চৌধুরী	৩৬৮
নীল পাপ	সোমনাথ ভট্টাচার্য	৩৭৭
মানুষের ব্যভিচার	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯১
প্রিয় মধুবন	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৪০৯
পানকৌড়ির রক্ত	আল মাহমুদ	৪১৭
অমলেন্দুর, মালতীর ও আরো কয়েক প্রকারের ভালোবাসা	দেবেশ রায়	৪২৮
প্রশ্নগুলো	দিব্যেন্দু পালিত	৪৩৫
সারাদুপুর	হাসান আজিজুল হক	৪৪১
শবসাধনা	কানাই কুন্ডু	৪৪৮
মাতৃকা	সমরেশ মজুমদার	৪৫৫
ক্রাইসিস	আবদুশ শাকুর	৪৬৭
তারাবিবির মরদপোলা	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	৪৯০
সীমার স্বপ্ন	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০৩
বিলয়	সুব্রত বড়ুয়া	৫০৮
কামকল্পনা	শঙ্করলাল ভট্টাচার্য	৫১৬
গর্ভ	সেলিনা হোসেন	৫২৫
চুল্লু	পঞ্চানন মালাকর	৫৩৬
বাতিপোকা	তপনকুমার দাস	৫৪২
অপত্য	শেখর আহমেদ	৫৪৮
ছন্দপতন	জাহান আরা সিদ্দিকী	৫৫৭
জমি	হান্নান আহসান	৫৬৯
পরপুরুষ	নাসরীন জাহান	৫৭৪
সোনার পাথরবাটি	পদ্মাবতী গোস্বামী	৫৮১
লেখক পরিচিতি		৫৮৭

পরকীয়া

বিপিনচন্দ্র পাল

সেও এই রকমই শরৎকাল। দেবী-পক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। আমি প্রয়াগে গুরুদেবের আশ্রমে তিন বৎসরান্তে তিন মাসের ছুটি লইয়া গিয়াছিলাম। আশ্রমটি একেবারে গঙ্গার উপরে। বর্ষা সে বারে দেরিতে হয়। গঙ্গা কূলে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। আকাশ নির্মল, জ্যোৎস্না না ফুটিলেও নক্ষত্রালোকে রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া আছে।

আমাদের নিয়ম ছিল, সন্ধ্যা আরতির পর, আহারান্তে সকলে দশটা না বাজিতেই ঘুমাইয়া পড়িতাম। গুরুদেব জিতনিদ্র; শয্যা পাতিয়া ঘুমাইতেন না। আসনে বসিয়াই সারারাত কাটাইতেন। তিনটা বাজিতে না বাজিতে আমরা সকলে উঠিয়া, মুখ হাত ধুইয়া, তাঁর নিকটে যাইয়া বসিতাম। কখনও কথাবার্তা হইত, কখনও সঙ্গীত হইত, অধিকাংশ সময়ই নীরবে যে যার আসনে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতেন।

আমি ঘরে ঢুকিবার সময় দেখিলাম আমার গুরুভাই—শা সাহেব আনমনে বাহিরে যাইতেছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কী জানিতাম না। ইনি জাতিতে মুসলমান। গুরুদেবের কৃপা পাইয়া বহুদিন তাঁহারই নিকট ছিলেন। আমরা তাঁহাকে শা সাহেব বলিয়াই ডাকিতাম। কেহ কেহ বা হরিদাসও বলিতেন। গুরুভাইদের মধ্যে গোঁড়া ব্রাহ্মণও দু'চার জন ছিলেন। তাঁরা শা সাহেবকে লইয়া খাওয়াদাওয়া করিতে রাজি ছিলেন না। এই জন্য প্রথম হইতেই গুরুদেব ইঁহাকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন। গুরুদেবের আসনের নিকটেই শা সাহেব দিন রাত শুইয়া, বসিয়া কাটাইতেন। গুরুদেবের আশ্রমে ভোজনাগারে যে যার জাত রাখিয়া চলিতেন; ভজনক্ষেত্রে কোনও জাতবর্ণের বিচার ছিল না। গুরুদেব কহিতেন সাধন-ধর্ম্মে—

লোকের মধ্যে লোকাচার
সদ্‌গুরুর কাছে সদাচার—
ইহাই এই কথার সত্য অর্থ।

২

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় শা সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গুরুদেব কহিলেন—"সে স্ত্রীলোকটিকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

শা সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। মুখে কথা সরিল না। আমরা সকলে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। শা সাহেবের ব্রত কি তবে ভঙ্গ হইয়াছে? আমাদের সাধনে বেশি কিছু ধরা বাঁধা ছিল না। গুরুদেবের বিধি ছিল তিনটি—

(১) নিত্য তিন বেলা নাম জপ করিবে।

(২) প্রাতঃ-সন্ধ্যা অন্ততঃ পঁচিশ মিনিট করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

(৩) সর্বদা সাধু-সেবা করিবে।

সাধু কারা? এই প্রশ্ন তুলিয়া গুরুদেব কহিতেন যাদের দেখা মাত্র অন্তরে ভগবদ্ভাব আপনা হইতে জাগিয়ে উঠে, তাঁরাই প্রকৃত সাধু। এখানে আর কোনও ধর্মাধর্মের বিচার নাই।

গুরুদেবের-সাধনে নিষেধও ছিল তিনটি—

(১) পরস্ত্রীর মুখ দেখিবে না।

(২) সুরাপান করিবে না।

(৩) পরনিন্দা করিবে না।

এই নিষেধবাক্য মনে করিয়াই গুরুদেব যখন এই গভীর রাত্রে শা সাহেবের নিকটে অপরিচিতা স্ত্রীলোকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমরা শিহরিয়া উঠিলাম। শা সাহেবের মতন নিষ্ঠাবান সাধক আমাদের ভজনগোষ্ঠীতে আর কেউ ছিলেন না।

শা সাহেব কহিলেন—"প্রভু! আমি ব্রত ভঙ্গ করি নাই, তার মুখ আমি দেখি নাই!"

গুরুদেব—"সে কথা জানি। তুমি তো গুরুর কৃপায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, ইহা কি আমার জানা নাই? কিন্তু সে বেচারিকে কোথায় ফেলিয়া আসিলে?"

শা সাহেব—"সে আপনার পথে আপনি চলিয়া গিয়াছে।"

গুরুদেব—"সব ঘটনাটা খুলিয়া বল। দেখছ না, এঁরা সকলে শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন।"

শা সাহেব ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন—

"প্রভো"। আপনি সর্বজ্ঞ—আপনার অগোচর ত কিছুই নাই। তবু আপনি যখন হুকুম কল্লেন, তখন সব খুলেই বলছি। আমি তো আপনার পায়ের কাছেই বসেছিলাম। হঠাৎ প্রাণটা বড়ো চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল কে যেন ঘোর বিপদে পড়ে কাকে ডাকছে। আমি সে ডাকে অস্থির হয়ে উঠলাম। আমার প্রাণের ভিতরেও কে যেন বার বার বলতে লাগল—জলদি যাও, জলদি যাও—নইলে স্ত্রীহত্যার পাতকী হবে। তাই আমি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে যন্ত্রারূঢ়ের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। সোজা একেবারে গঙ্গার ঘাটে গেলাম। গঙ্গা প্রবলতরঙ্গে কূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে। ঘাট নির্জন নিস্তব্ধ। কিন্তু সামনে কে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। একটা কলসিত জল ভরিতেছে। দেখিয়া আমি লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত ধরিলাম।" সে বলিল—"তুমি কে?"

আমি—তুমি কে? আত্মহত্যা কচ্ছ কেন? জাননা এ বড়ো পাপ?

সে—পাপের জ্বালা জুড়াইতেই মরতে এসেছি। আমায় আটকাইও না।

আমি—পাপের জ্বালাটা কোথায়? শরীরে না মনে?

সে—শরীর মন দুইই জ্বলে যাচ্ছে।

আমি—ঐ জ্বালাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। মরতে গিয়ে প্রায়শ্চিত্তের ব্যাঘাত দিচ্ছ—দেখ।

সে—অত শত বুঝি না। আমায় মরতে দাও। মরা ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই।

আমি—মরলেই কি জ্বালা যাবে? পাপের জ্বালা তো স্মৃতির জ্বালা। মরলে কি পাপ ভুলে যাবে? একথা তোমায় কে বল্লে?

সে—সে কী কথা? সব ভুলব, সংসার আঁধার হবে, কাউকে দেখব না, কারো কথা শুনব না—আর কেবল পাপের কথাই মনে থাকবে? এই কি সম্ভব?

আমি—সাধু শাস্ত্রে তো তাই বলেন। মরণে সব নষ্ট হয়, কিন্তু স্মৃতি নষ্ট হয় না। ঐ পাপের স্মৃতিই মরণের পরেও মানুষকে পুড়াইয়া মারে। এখানে তবু পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। যে আত্মহত্যা করে, তার ঐ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সে—তবে আমি যাই কোথায়?

আমি—ঘরে ফিরে যাও।

সে—ঘর নাই।

আমি—আপনার জন যেখানে আছে, সেখানে ফিরিয়া যাও।

সে—আমার কেউ নাই। যারা আছে তারা মুখ দেখবে না। তাদের মুখ দেখাতে পারব না। কোথা যাব? কোথা গেলে সব ভুলব?

আমি—চল, আমি তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসি—যেখানে কেউ তোমাকে চিনে না, যাদের কাছে থাকলে, কেউ তোমার খোঁজখবর পাবে না। সেও মরার মতনই হবে। চল, আমি তোমাকে তাদের কাছে রেখে আসি।

এই কথা শুনে সে আমার সঙ্গে জল হতে উঠে চলল। আমি নিকটের মস্‌জিদের মৌলবির কাছে তাহাকেই লইয়া গেলাম। মৌলবি আমার বালাবন্ধু। তাঁকে সকল ঘটনা বললাম। তিনি বললেন—বেশ। আমার এখানে আশ্রয় পাবে। তখন আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে ডেকে বল্লাম—মা তুমি এঁর কাছে থাক। ইনি তোমাকে নিজের মেয়ের মতন রাখবেন।

এতক্ষণ তার বাহ্যজ্ঞান ছিল না বল্লেই হয়। পুতুলের মতন আমার পেছনে পেছনে এসে, মস্‌জিদের দাবায় মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথায় যেন তার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। খানিকটা এদিক ওদিক চেয়ে, আমার বন্ধু টিকে দেখে—চমকে উঠে বল্লে—"এ যে মুসলমান।"

আমি—ইনি আমার বন্ধু—তুমি নিরাপদে, আদরে, মেয়ের মতন ইঁহার কাছে থাকবে।

সে—আমি যে বামুনের মেয়ে। মুসলমানের ঘরে থাকব কী করে?

আমি—জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলে, সে স্থান কি এর চাইতে ভালো?

সে—সে যে গঙ্গা—পতিতপাবনী। গঙ্গায় ডুবলে পাপ ধুয়ে যে'ত। আমার সাহসে কুলাইল না। ভেবনা বুড়া, তোমার কথায় ফিরে এসেছি, প্রাণের মায়া ছাড়তে পারলাম না। আর...। না আমি চল্লাম। জাত ধর্ম খুয়াতে পারব না।

এই বলিয়া সে ফিরিয়া চলিল। আমার বন্ধু টি সহজেই চটিয়া যান। ইহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"রোখ্—হারামজাদি। ইঁহাসে জানে নেই সেকেগি। এই বলিয়া গেট বন্ধ করিয়া, পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন।'

সে বলিল—যে মরতে যাচ্ছে, তুমি তাকে কি ভয় দেখাও?

মৌলবি—মরতে পারবে না। ভালো ভাবে থাকতে চাও—অন্দরে যাও। নইলে বন্দি কুত্তির মতন বেঁধে রাখব।

সে তার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে দেউড়ির দরজার দিকে চলল। মৌলবি তখন তার হাত ধরতে গেলেন।

সে—খবরদার সাহেব। আমায় ছুঁইও না।

মৌলবি—খবরদার কাকে বলছ জান না—এই বলিয়া তাহাকে ধরিতে হাত বাড়াইলেন। চক্ষের পলকে সে নারী তখন তীক্ষ্ণ ছুরি বাহির করিয়া বলিল—"সাহেব, স্ত্রীলোক যখন

গভীর নিশাকালে জলে ডুবতে যায়—তখন সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেই বাহির হয়। তোমার মতন দস্যু পথে ঘাটে থাকতে পারে সে জানে। সাবধান—আর এক পা এগোবে তো এই ছুরিতে প্রাণ হারাবে।"

মৌলবি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আমি এগিয়ে বলিলাম—ছেড়ে দিন। জোর জবরদস্তি করে রাখা যাবে না। তখন তিনি—"কাফের, বান্দি, কুত্তি—জাহান্নামে যাবি—যা", এই বলিয়া দরজা খুলিয়া, তাহাকে লাথি মারিয়া বাহির করিয়া দিলেন।

গুরুদেব—তারপর?

শা সাহেব—তার পর তার কী হ'ল জানিনা। হয়তো সে আবার গঙ্গায় ডুবতে গেছে।

গুরুদেব—শা সাহেব এখনও চিত্ত নির্মল হয়নি যে। এখনও বুঝলে না আমরা যেখানের যাত্রী সেখানে—

টুটে যায় সব ধন্ধা।
য়হা রাম রহিম এক বান্দা।
কাফেরে মুসলমানা।

আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন—এদের কেউ যদি কোনও মুসলমান স্ত্রীলোককে এ অবস্থায় পেত, হিন্দুর ঠাকুর বাড়িতে নিয়ে যেত না—মুসলমানের আশ্রয়েই রেখে আসত। শা সাহেব, এখনও তুমি হিন্দু-মুসলমানে ভেদ কর?

শা সাহেব—আপনি অন্তর্যামী। আমি যে মুসলমান একথা ভুলতে পারছি না।

গুরুদেব—ভুলতে কে বলে? আমি যে হিন্দু, তাই কি ভুলেছি, না ভুলতে পারি, না ভুলতে চাই? তবে শ্রীগুরুর এই শিক্ষা—হিন্দু বলে আমি মুসলমানের চাইতে বড়ো—এ অভিমান করব না। যিনি জগতের মালিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর সৃষ্টি। সবারই ভিতরে তিনি আছেন। আর হিন্দু, হিন্দুর পথে, মুসলমান মুসলমানের পথে তাঁরই কাছে যাবে। তাঁকেই পাবে। তাঁর চরণে সকলেই দাস হয়ে থাকবে। এইটি মনে করে রাখবার জন্যই তো আমাদের ভজন গোষ্ঠীতে হরি নামও করি, আল্লা নামও করি।

পাশের ঘরে এক সাধক তখন গান ধরিয়াছেন—

"হরিসে লাগি রহরে ভাই।"

এই গান শেষ হইলেই গুরুদেব গুণ্ গুণ্ করিয়া গাইতে লাগিলেন :—

"হর্‌দমে আল্লার নাম লইও।"

তখন শা সাহেবও তাঁর সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন

"দমে দমে লইওরে ভাই, দমে দমে লইও।"

আমরা তখন সকলে মিলিয়া এই হিন্দু সাধুর আশ্রমকে, পবিত্র আল্লা-নামে মুখরিত করিয়া তুলিলাম।

প্রভাতের আলো ফুটিতে আর সকলে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে চলিয়া গেলে, গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই অভাগিনীর শেষ দশা কী হইল?"

গুরুদেব কহিলেন—"তাঁর জন্য কোনও ভাবনার কারণ নাই। অন্নপূর্ণা ঠাকুরানি তাঁহাকে গঙ্গার ঘাট হইতে আবার ফিরাইয়া আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা ঠাকুরানি আমাদের সাধনেরই লোক। বয়স্থা ব্রাহ্মণ বিধবা। তাঁর একটিমাত্র পুত্র

ছিল। একই সঙ্গে ঠাকুর তাঁহার পতি পুত্র দুইকেই কাড়িয়া লইয়া যান। সেই সময়েই এই পতিবিয়োগবিধুরা ও পুত্রশোকাতুরা ব্রাহ্মণ কন্যা গুরুদেবের আশ্রয় লাভ করেন। সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা। দশ পনেরো বছর হইতে ইনি এই আশ্রমেই আসিয়া বাস করিতেছেন। আরও দুচারিজন গুরুভাগনীও তাঁর সঙ্গে থাকেন। আশ্রমের আহারাদির ব্যবস্থা ইঁহাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। এই অসহায়া রমণী অন্নপূর্ণা ঠাকুরানির আশ্রয় পাইয়াছেন শুনিয়া আমার ভাবনা দূর হইল।

গুরুদেব কহিলেন—কথাটা যেন বাহির না হয়। মেয়েরা ইঁহার ইতিহাস কিছুই জানেন না। যে স্ত্রীলোকটির কথা শা সাহেব কহিলেন, তিনি যে এই আশ্রমেই আসিয়া উঠিয়াছেন, তুমি ছাড়া আর কেহই একথা জানে না। তোমাকে আর একটা কথাও বলিয়া রাখি। ইঁহার পিতামাতা তোমাদের সাধনেরই লোক ছিলেন। সে সম্পর্কে ইনি আমাদের পরিবারভুক্ত বটে।

৩

দিন চার পাঁচ পরে আমি প্রথমে ইঁহাকে দেখিলাম। সেই দিন প্রাতঃকালে গুরুদেবের নিকটে ইঁহার দীক্ষা হয়। সেই সঙ্গে আরও দুই তিনটি মহিলা দীক্ষিত হইয়াছিলেন। গুরুদেবের আশ্রমে নিয়ম ছিল যে, কোনও নূতন লোক দীক্ষা লইতে আসিলে, গুরুদেব তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলে, দীক্ষাকালে আমাদেন ভজন গোষ্ঠীর একটা সঙ্গত হইত। গুরুদেব যাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে ডাকিতেন, তাঁরাই এই সঙ্গতে উপস্থিত থাকিতেন। এই দিনেও গুরুদেব আমাদের পাঁচ সাত জনকে দীক্ষাকালে উপস্থিত থাকিতে বলেন। দীক্ষার অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনও কিছুর বাহুল্য ছিল না। দীক্ষার্থীরা স্নানান্তে নিজেদের সন্ধ্যাআহ্নিকাদি করিয়া গুরুদেবের নিকটে উপস্থিত হইতেন। প্রথমে দু'চারিটি ভজন হইত। তারপর গুরুদেব ইঁহাদিগকে ইষ্টনাম দান করিতেন এবং শক্তি সঞ্চার করিয়া, কী করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেন। সেই সময়ে শিষ্যেরা সকলে প্রাণায়ামের সঙ্গে নিজ নিজ জপ করিত। এই দিনও আমরা সকলে উপস্থিত হইলে এইরূপেই নতুন দীক্ষা প্রার্থিনীদের দীক্ষা হইল।

নাম দিবার পূর্বে গুরুদেব দীক্ষার্থিনীদের জনে জনের নাম করিয়া ভজন গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তখন শুনিলাম ইঁহার নাম হৈমবতী।

নাম পাইয়াই হৈমবতী কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। একটি মহিলা ইঁহার অবস্থা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার মুখে জল ছিটাইতে গেলেন।

গুরুদেব ইঙ্গিত করিলেন, ইঁহাকে কেহ যেন স্পর্শ না করে। কহিলেন, শ্রীগুরুর নাম ইঁহার ভিতরে যে কাজ করিতে চাহে করুক, তাহার ব্যাঘাত জন্মাইও না। আমাদিগকে ভজন গাহিতে কহিলেন। আমরা দু'তিনটি ভজন গাহিলাম। কিন্তু হৈমবতীর বাহ্য চৈতন্য ফিরিয়া আসিল না। তখন গুরুদেব নিজে ভাবাবেশে গাহিতে লাগিলেন,

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এই নাম কীর্তন করিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় তিনচার ঘন্টা কাটিয়া গেল। এদিন ভজনে যেমন জমাট হইয়াছিল, বহুদিন এমন জমাট দেখি নাই। যেমন হৈমবতীর, সেইরূপ গুরুদেবেরও বাহ্য লোপ পাইয়াছিল। গুরুদেব 'বোল্, বোল্' বলিয়া চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তেরা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে